ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ

প্রণব মুখোপাধ্যায়

[স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির এই রচনাটি তাঁর অনুপস্থিতিতে পঠিত হয়েছিল। ইনস্টিটিউটের বুলেটিনের ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরেজি ভাষণটির অনুবাদ করেছেন **সুমনা সাহা**।]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রায় সাত হাজার মানুষ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ভারতীয় সভ্যতা তথা হিন্দুধর্মের গভীরতার প্রতি পাশ্চাত্যের চোখ খুলে দিয়েছিল। স্বামীজী যখন শিকাগো গিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ ছিল কয়েকটি ছোট ছোট উপনিবেশে বিভক্ত, দারিদ্র্যে অশিক্ষায় জর্জরিত। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত না। হিন্দুদের মনে করা হত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অশিক্ষিত। তথাপি হিন্দু দর্শনের মহত্ত্ব এবং ধর্মীয় একতা ও সর্বজনীনতার কথা বিশ্বসমক্ষে ঘোষণা করবার সাহস ও দৃঢ়তা স্বামীজীর ছিল। পাশ্চাত্যবাসীকে তিনি বেদান্তদর্শনের কথা বলেন, যে-দর্শন মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক জীবই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি—'যত্র জীব তত্র শিব'। স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর বাণী ছিল—''ওঠো! জাগো! লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না!'' তাঁর এই বাণী ভারতবর্ষের ধমনীতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছে। আজও তা প্রাসঙ্গিক, যেহেতু এক বিরাট রাষ্ট্ররূপে আপন সুপ্ত শক্তি উপলব্ধির সুযোগ ভারতের রয়েছে।

একশো পঁচিশ বছর আগে শিকাগোয় স্বামীজী যে-বার্তা প্রচার করেছেন, তা বর্তমান সময়ের মতো এতখানি প্রাসঙ্গিক এর আগে আর কখনও হয়ে ওঠেনি বললেও বোধ করি ভুল বলা হবে না। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মসভায় এক তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত দিব্যবাণীর সঙ্গে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সেই একই দেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ঘটনার কী দুস্তর ফারাক! বিশ্ববাসী যদি স্বামীজীর শুধুমাত্র 'সকল ধর্মকেই সত্য বলে জেনে তাদের প্রতি সহনশীল ও উদারভাব অবলম্বন' করার

উপদেশ অনুসরণ করত, তাহলে এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এড়ানো সম্ভব হত। আমরা ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখের পর প্রায় দু-দশক অতিক্রম করেছি বটে, কিন্তু ধর্মের নামে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা তারপর থেকে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র স্বামীজীর উদ্ঘোষিত 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-র শাশ্বত বাণীই বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপন করতে সক্ষম। তাঁর বক্তৃতাসমূহ কথার কথা মাত্র কিংবা তাঁর বিশালবুদ্ধির প্রকাশ মাত্রই ছিল না, সেগুলি ছিল তাঁর সত্তার প্রচণ্ড বহির্নিঃসরণ, তাঁর বিশাল হৃদয়-নিঃসৃত সর্বজনীন প্রেমের অপ্রতিরোধ্য প্রবাহ। আধ্যাত্মিকতার এক গভীর স্তর থেকে স্বামীজী সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্মবোধ করেছিলেন। প্রত্যেক জীবের আধ্যাত্মিক একত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন এবং এই অনুভূতিই তাঁকে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে সর্বজীবে প্রেমের সামর্থ্য প্রদান করেছিল। তাঁর বক্তৃতারম্ভে সর্বপ্রথম উচ্চারিত 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'—এই শব্দরাজির মধ্য দিয়ে এই প্রকৃত প্রেম ও সর্বজনীন একাত্মবোধই প্রকাশিত হয়েছিল।

শিকাগো বক্তৃতামালা স্বামীজীর পাশ্চাত্য কর্মযজ্ঞের 'সমরনীতি'র ইস্তাহার স্বরূপ। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাটি ছিল 'হিন্দুধর্ম'। অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে বলতে পারি, এটি একটি বিস্ময়কর বিষয়—গভীরতা, পরিধি, স্পষ্টতা, মৌলিকতা ও উদ্বোধক শক্তি—সবদিক থেকেই এটি বিস্ময়কর।

যুগযুগান্ত ধরে যে-সমস্ত সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খল, কুসংস্কার ও রীতিনীতি এই সুপ্রাচীন ধর্মকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, স্বামীজী তা ভেঙে দিয়েছেন। স্বামীজীর আগমনের পূর্বে হিন্দুধর্ম ছিল জাতিভেদ ও পুরোহিততন্ত্র সংকুলিত একটি পৌত্তলিক ধর্ম, যার অধিকাংশই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বামীজী সমস্ত প্রাচীর ভেঙে একটি সর্বজনীন ধর্মের রূপদান করে হিন্দুধর্মকে সকলের জন্য অবারিতদ্বার করে দিলেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ধর্মমহাসভায় এই সর্বজনীন হিন্দুধর্মকেই স্বামীজী উপস্থাপিত করেছিলেন। তখনকার দিনে 'কালাপানি' অর্থাৎ সাগর পেরিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার দুঃসাহস করলে তাকে হিন্দুসমাজ থেকে বহিষ্কার করা হত—এদিক থেকে দেখলে স্বামীজীর কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দকেও এই সামাজিক অস্বীকৃতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেননি মন্দির কর্তৃপক্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে হিন্দু সমাজে নানা সংস্কার আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিল। এই আন্দোলনগুলি বহুকাল ধরে চলে আসা হিন্দুধর্মের কতগুলি প্রাচীন বিশ্বাস, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক

ভিত্তির সংস্কারসাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজী বুঝেছিলেন, হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনের থেকেও বেশি প্রয়োজন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ তার আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রাণসঞ্চার, তার আধ্যাত্মিক আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (যা কিনা পাশ্চাত্য বস্তুবাদ ও ধর্মান্ধতার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন) এবং তার মহান আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। এই বিরাট কাজের দায়টি স্বামী বিবেকানন্দ নিজের কর্তব্যরূপে স্থির করেছিলেন। এই লক্ষ্যপ্রাপ্তির প্রথম পদক্ষেপ ছিল অপ্রয়োজনীয় অংশ থেকে প্রয়োজনীয় অংশের পৃথকীকরণ। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির আদ্যন্ত আধ্যাত্মিকতা; তার সারনির্যাস আধ্যাত্মিকতাই। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, ''প্রত্যেক জীব স্বরূপত দিব্যভাবাপন্ন। বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এই দিব্যভাবের প্রকাশ ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মানসিক সংযম অথবা দার্শনিক বিচার—এর যে-কোনও একটি কিংবা একাধিক অথবা সবকটির প্রয়োগ দ্বারা এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হও ও মুক্ত হও। এই হল সমগ্র ধর্মের সার। নীতি, তত্ত্ব কিংবা আচার-অনুষ্ঠান বা পুঁথিপত্র-মন্দির-মসজিদ গৌণ ব্যাখ্যান মাত্র।''

এইভাবেই স্বামীজী আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের ঐক্যসাধন করলেন, যা কিনা হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। দ্বিতীয় ধাপে স্বামীজী প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ও মহান আচার্যগণ দ্বারা আবিষ্কৃত সনাতন শাশ্বত সত্যের ব্যাখ্যা করলেন আধুনিক ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে, যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষ তা সহজে ধারণা করতে পারে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, আধ্যাত্মিক জীবনের চিরন্তন সত্য ও নীতিগুলিই বেদরূপে মূর্ত হয়েছে, যে-বেদ জগতের সকল ধর্মমতের ভিত্তি ও উৎস। অবশ্য প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব শাস্ত্র রয়েছে—বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক প্রভৃতি। তারা বেদকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করবে কীভাবে? তার উপর হিন্দুর বিশ্বাস যে বেদ অনাদি এবং 'অপৌরুষেয়', অর্থাৎ কোনও মানবের দ্বারা সৃষ্ট বা রচিত নয়। এই দুটি দাবির যুক্তি কী?

এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করেছেন স্বামীজী তাঁর 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতার সূচনায়। ''আপ্তবাক্য বেদ থেকে হিন্দুগণ তাঁদের ধর্ম লাভ করেছেন। তাঁরা বেদকে অনাদি ও অনন্ত বলে বিশ্বাস করেন। একটি গ্রন্থকে অনাদি ও অনন্ত বললে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু 'বেদ' শব্দ দ্বারা কোনও গ্রন্থবিশেষ বোঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে-সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করে গিয়েছেন, বেদ সেগুলির সঞ্চিত ভাণ্ডার। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার আগেও যেমন তা সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমগ্র মানবজাতি ভুলে গেলেও যেমন তা থাকবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মও সেইরকম। আত্মার সঙ্গে আত্মার যে-নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবের সঙ্গে তার পিতার যেমন, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সেইরকম দিব্যসম্বন্ধ। আবিষ্কৃত হওয়ার আগেও তা ছিল এবং সকলে ভুলে গেলেও তা অপরিবর্তনীয় থাকবে।''

আধুনিক বিশ্ব বিজ্ঞান-শাসিত। বিজ্ঞান ও যুক্তিকে প্রায়ই ধর্মের ভিত্তির বিলোপসাধনের কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আমার মনে হয়, এই ধরনের প্রচেষ্টা ও সমষ্টি-চিন্তার (social thought) পরিণাম সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। এটা বললে হয়তো ভুল বলা হবে না যে, যেহেতু ধর্মকে নীতির রক্ষক বলে মনে করা হয়, সেহেতু মানুষ ধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেললে নীতিহীনতা, অপরাধমূলক ও হিংসাত্মক কাজকর্ম এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সময়ের চিন্তাবিদদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন করেছিলেন, যার ফলে ধর্মের প্রতি

জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলনের সাধারণ ভিত্তিগুলি উন্মোচিত করেছিলেন। আমি পুনরায় তাঁর 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করছি—''একত্ব খুঁজে বের করা—এছাড়া বিজ্ঞান আর কিছুই নয়। যখনই কোনও বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে পৌঁছয়, তখন তার অগ্রগতি থেমে যাবে, কারণ তখন বিজ্ঞান তার লক্ষ্যে পৌঁছেছে।... ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন সে আবিষ্কার করে সেই একমাত্র সত্তাকে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচঞ্চল ভিত্তি, যিনি একমাত্র আত্মা—অন্য সকল বস্তুই যাঁর মায়ার প্রকাশ। এইভাবে বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অবশেষে অদ্বৈতে অর্থাৎ একত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্ম আর এগোতে পারে না। সব বিজ্ঞানের এটাই চরম লক্ষ্য। অন্তিমে সকল বিজ্ঞানই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় 'সৃষ্টি'র পরিবর্তে 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।''

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুধর্ম অসংখ্য শাখা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শংকর, রামানুজ, মধ্ব প্রমুখ আচার্যগণের শিষ্যদের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ-বিতণ্ডা লেগেই থাকত। স্বামীজী দেখিয়েছেন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত হল ঈশ্বর-উপলব্ধি রূপ পরম লক্ষ্যের যাত্রাপথে মনের তিনটি অবস্থার প্রকাশমাত্র। এই আপাতভেদ বাদ দিলে হিন্দুধর্ম এক অখণ্ড সমগ্রতা, বেদান্ত-দর্শনের অবিনশ্বর ভিত্তির উপরে যার প্রতিষ্ঠা। এইভাবে, স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা হিন্দুধর্মের সামগ্রিক একত্বের পথ করে দিয়েছে, হিন্দুদের মধ্যে একত্ব-চেতনা জাগ্রত করেছে। 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতা এই একত্ব-প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যেহেতু তা দর্শনের সকল শাখা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাধারণ ভিত্তিভূমি দিয়েছে।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজী হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্রীয় ধারণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—যেটি অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মকে পৃথক করে—আত্মার দেবত্ব। মানবের প্রকৃত স্বভাব হল 'আত্মস্বরূপ'—সে দেহও নয়, মনও নয়। এই আত্মাকেই 'আমি' বা 'সত্তা' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। আত্মা হল পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যাকে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়। অতএব মানবের প্রকৃত স্বভাব দিব্য। এটিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার মুখ্য ভাব, যা তিনি শিকাগোতে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন এবং শ্রোতাদের মন বিরাট এক আধ্যাত্মিক উচ্চতায় উত্তীর্ণ ও উন্নীত করেছিলেন।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজী অংশগ্রহণ করেছিলেন ধর্মসমন্বয়ের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে। মহাসভার সমগ্র অধিবেশন চলাকালীন স্বামীজী এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর গুরুর উপদেশের মূল সুরটি বিস্মৃত হননি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ না করেই তাঁর ধর্মসমন্বয়তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে উপস্থাপিত করেছেন। উদ্বোধনী ভাষণেই স্বামীজী 'শিবমহিম্নস্তোত্র' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :

''রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥''

—বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়, তেমনই হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশত সরল ও কুটিল (ধর্মের) নানা পথে যারা চলেছে, তুমিই সেই সকলের একমাত্র লক্ষ্য।'

'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতায় সর্বজনীন ধর্মের ধারণাটি স্বামীজী যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, সেটি ওই ভাষণের উৎকৃষ্টতম অংশ। তাঁর মতে, সকল ধর্মই একটি বিরাট সর্বজনীন ধর্মের প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ''যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তা কখনও কোনও দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ থাকবে না; যে-অসীম ভগবানের

বিষয় ওই ধর্মে প্রচারিত হবে, ওই ধর্মকেও তাঁর মতোই অসীম হতে হবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত, খ্রিস্টভক্ত, সাধু, অসাধু—সকলের উপর সমভাবে আলো বিতরণ করবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম বা মুসলিম ধর্ম হবে না, কিন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হবে, অথচ তা সত্ত্বেও তার দ্বারা উন্নতির অসীম সম্ভাবনা থাকবে; সেই ধর্ম তার আপন উদার, অসংখ্য হস্ত প্রসারিত করে নিম্নতম প্রবৃত্তিসম্পন্ন অতি হীন মানুষ থেকে শুরু করে (হৃদয় ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষে) মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী মানুষ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে।... সেই ধর্মের নীতিতে কারও প্রতি অসহিষ্ণুতা বা নিপীড়নের স্থান থাকবে না। সেই সর্বজনীন ধর্ম প্রত্যেক নরনারীর দিব্যস্বরূপের স্বীকৃতি দান করবে, সে-ধর্মের সকল সুযোগসুবিধা ও সমগ্র শক্তি সৃষ্ট হবে মানবজাতিকে তার প্রকৃত দিব্যস্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করবার জন্য।"

স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ পাশ্চাত্য জগতে ভারতকে অতুল গৌরব দান করেছিল। ভারত আধ্যাত্মিক সম্পদে এত বিপুলভাবে সমৃদ্ধ যে স্বামী বিবেকানন্দের মতো অগাধ জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ একজন মহাপ্রতিভাধর মানবের জন্ম দিতে সক্ষম—একথা জেনে বিশ্ববাসী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও স্বামীজীর বক্তৃতা পাশ্চাত্যবাসীর মন থেকে ভারতবর্ষ, ভারতবাসী ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম ও সর্বাপেক্ষা পিছিয়ে পড়া দেশগুলির অন্যতম। বারংবার পরাজয়, বিদেশি শক্তির অধীনতা ও বিশ্বের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে ভারতবাসীর মন থেকে নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল, তাদের অপরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সামর্থ্য ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনও কাজ আরম্ভের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজীর মানসিক সাহস ও ওজস্বিতা, পাশ্চাত্য সমাজে তাঁর অর্জিত সাফল্য এবং জীবের অন্তর্নিহিত দেবত্বে বিশ্বাসের ধারণা ভারতবাসীর মনে আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তুলেছিল। অন্যান্য জাতির তুলনায় পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও এটাই সত্য যে, ভারত এক বিরাট আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী যা আজ পাশ্চাত্যের একান্ত প্রয়োজন—এই উপলব্ধিই ভারতকে আন্তর্জাতিক ব্রতধারী এক রাষ্ট্রে পরিণত করে তুলেছে।

ভারতবাসীকে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "ওঠো! জাগো!" চিত্ত আলোড়নকারী ভাষণ ও পত্রাবলির মাধ্যমে এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতাত্মাকে জাগ্রত করেছিলেন নিঃসন্দেহে। এই জাগরণের ফলস্বরূপ ভারতের রাজনৈতিক পুনরুত্থান হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণ। সেই ঘটনার পর থেকে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও ভারতবাসী আর আগের মতো থাকেনি। অতীত ছায়ার আবরণ সরিয়ে এক নতুন জনগোষ্ঠী, নতুন সংস্কৃতি ও নতুন বিশ্বধর্ম নিয়ে উদ্ভিন্ন হয়েছে নতুন ভারতবর্ষ। এই নতুন ভারতই এখন সম্পদ, শক্তি, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপূরণের ঐক্যসাধনে সামনে এগিয়ে চলেছে।✠